অরিন্দম দাশগুপ্ত

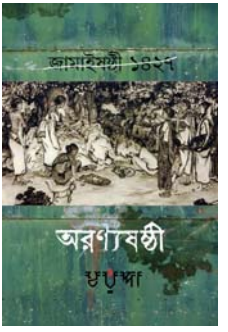

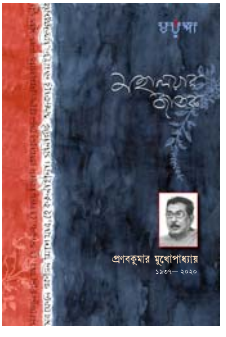

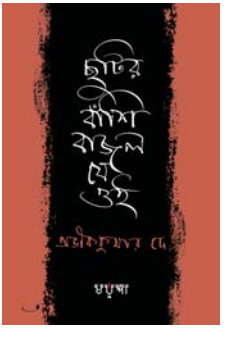

প্রকাশিত হয়েছে সংগ্রহ করুন

ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন

http://harappa.co.in/harappa_booklet.html

বিষ
বিষাক্ত
বিষময়

অরিন্দম দাশগুপ্ত

পুনশ্চ

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ১৭ অগস্ট ২০২০
শ্রাবণ-সংক্রান্তি ১৪২৭ প্রকাশিত হল
‘বিষ বিষাক্ত বিষময়’

তথ্যসংশ্লেষ ও লিখন
অরিন্দম দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহযোগিতা
সৌম্যদীপ

সম্পাদক
সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

আজ শ্রাবণ-সংক্রান্তি—বাংলার নানা জেলায় গ্রামগঞ্জে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হচ্ছে মনসা পুজো। মনসা সর্পদেবী। অন্যভাবে বললে তিনি বিষের দেবী। গাঁ-ঘরে স্বামীসন্তান নিয়ে ঘরকন্না করতে ব্যস্ত এয়োস্ত্রীরা সর্পমাতাকে তুষ্ট রাখতে পুজো-ব্রত যে করবেন, তা অস্বাভাবিক নয়। শ্রাবণ মাসের এই পুজোর উল্লেখ আছে *মনসামঙ্গল* কাব্যে, যেমন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসামঙ্গল, প্রথম খণ্ডে* বলা হয়েছে:

জ্যৈষ্ঠ অতি পূজা হব দশরা-দিবসে॥
আষাঢ়েতে হব নাগ পঞ্চমীর পূজা।
ঝাঁপান করিব যত ঝাঁপানিয়া ওঝা॥
শ্রাবণ মাসেতে লবে খরা তরা।
খই দধি দিয়া লোক পলিবেক চিরা॥

এর উল্লেখ আছে বিজয় গুপ্তের *পদ্মপুরাণ*-এ:

চান্দোসদাগর বেটা চম্পকিয়া রাজা।
চম্পক নগরে বেটা মানা করে পূজা॥
এইত শ্রাবণ মাসে মনসা পঞ্চমী।
লুকাইয়া সনকা পূজে তথা গেলাম আমি॥

এমনকি এই মাসে মনসা পুজোর কথা পাওয়া যায় দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা*-র 'মলুয়া' পালায় (পৃ ৮৪):

শায়ন মাসেতে লোকে পূজে মনসা।
এই মাসেতে আইব সোয়ামী মনে বড় আশা॥

'কমলা' পালা-য় (পৃ ১৬১):

কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ন্যা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে॥

'দেওয়ান ভাবনা' পালা'-য় (পৃ ১৮৭):

শায়ন মাসেতে দূতি পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিলগো আমার মনের আশা॥

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*-র চতুর্থ খণ্ডে, দ্বিতীয় সংখ্যায়, 'বগুলার বারমাসী'-তে (পৃ ২২৫) উল্লেখ রয়েছে:

শাওন বাওনা মাস আথাল পাথাল পানি।
মনসা পূজিতে কন্যা হইল উৎযোগিনী॥
কান্দিয়া বসাইল ঘট আপনার গিরে।
প্রাণপতি ঘরে আইসে মনসার বরে॥

চাচর চিক্কণ কেশে গিরটি মাঞ্জিল।
নূতন পিটালি দিয়া আলিপনা দিল॥
পঞ্চনাগ আঁকে কন্যা শিরের উপরে।
মনসা দেবীরে আঁকে অতি ভক্তিভরে॥
শির নোয়াইয়া করে শতেক পন্নতি।
"বর দাও মনসাগো ঘরে আইওক পতি॥"

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষের সময় যে মঙ্গলকাব্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচিত হয় তার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন এবং প্রণিধানযোগ্য এই *মনসামঙ্গল* কাব্য। লোকমুখে এর প্রচার-প্রসার সেকালে যে হয়েছিল তা এর জনপ্রিয়তা থেকেই স্পষ্ট। পালাগানের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কোথাও-কোথাও একাধিক দিনব্যাপী সংগীতময় আনুষ্ঠানিকতায় আয়োজন হয় মনসাব্রতর। লোকসাহিত্য পুথির পাতা থেকে বেরিয়ে এসে সার্থকতা খুঁজে পায় মৌখিক গতিময়তায়। কখনও তা স্থান পায় শিল্পীর কল্পনায় পটচিত্রে ও পটের গানে। পাড়া-ঘরে মেয়ে-বউরা উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে গেয়ে ওঠে:

মনসা জগতে গৌরী জয় বিষহরি।
পদ্মফুলে জন্ম মা তোর মনসা কুমারী॥
নাগের হোল খাট-পালঙ্ক নাগের সিংহাসন।
হংসপৃষ্ঠে নাগমাতা মনসার আসন॥
তরজে গরজে বেণী মোজড়ায় দাড়ি।
কাঁধে নিল চাঁদ বেনে হেতালের বাড়ি॥
যদি বেটির ঢ্যামনীরে নাগাল আমি পাই।
মারিব হেতালের বাড়ি কোমর চূড়ায়॥
সেই গান বিষহরি আপনি শুনিল।
ক্রোধভরে চাঁদবেনের ছ'বেটারে খাইল॥

আর এই জনপ্রিয়তার গভীরতা আমরা বর্তমান বিজ্ঞাননির্ভর পৃথিবীতেও অনুভব করি লৌকিক জীবনে লোকদেবী মনসার পুজো-ব্রত-পালুনির ঘনঘটা দেখে।

চাঁদসদাগরের জেদ, ছয়-ছয়টি পুত্র-হারানোর শোক, বেহুলার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে কঠোর সংকল্পের সাহিত্য-কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিষধর সাপের দংশনে চাঁদের পুত্র ও বেহুলার স্বামী লখিন্দরের মৃত্যু। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন ছিল তেমনি তার পরিবর্তিত রূপ আজ আমরা দেখতে পাই তুলনামূলক আধুনিক রহস্যকাহিনি বা গোয়েন্দা গল্পেও। বর্তমান পুস্তিকায় লেখক মূলত বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যে বিষের ব্যবহারটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

যে-কোনো গোয়েন্দা-কাহিনির মূলে থাকে রহস্যময় এক বা একাধিক মৃত্যু বা অন্য কোনো গর্হিত অপরাধ। বিষ প্রয়োগ করে খুন করতে যেহেতু বিশেষ কোনো মুনশিয়ানার প্রয়োজন হয় না এবং অপরাধটি নিঃশব্দে সেরে ফেলা যায়, তাই বোধহয় গোয়েন্দা-সাহিত্য স্রষ্টারা রহস্যের জাল বুনতে খুনিকে দিয়ে বিষের ব্যবহার করিয়েছেন। যেমন খ্যাতনামা বিদেশি গোয়েন্দা-কাহিনিকার আগাথা ক্রিস্টির চোদ্দোটি রহস্য-গল্পে এ ধরনের বিষের ব্যবহার করে খুনের ঘটনা আছে। এর প্রভাব বাংলা রহস্য-কাহিনিতেও স্বাভাবিকভাবে পড়েছিল। তবে শুধু গল্পে নয়, বাস্তব জীবনেও ষড়যন্ত্র-হত্যায় বিষের ব্যবহার ঘটত অহঃরহ। সে-উদাহরণ থেকেও কাহিনিকাররা প্রভাবিত হতেন। প্রাথমিকভাবে ধুতরো-কুচিলার বিষের প্রয়োগ দেখা গেলেও

পরে মাকড়সার রস থেকে 'ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া'য় না-থাকা বিষের প্রয়োগও গোয়েন্দা-সাহিত্যে পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জন গুপ্ত থেকে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায় থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—সব লেখকই তাঁদের কোনো-না-কোনো রহস্য-গল্পে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ও গোয়েন্দাদের ধুরন্ধর বুদ্ধি খাটিয়ে খুনিকে ধরার কাহিনি তুলে ধরেছেন। বেশ কিছু কাহিনি জনপ্রিয়তার কারণে চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। তবে বিষয়টা এমন নয় যে গোয়েন্দা গল্প ছাড়া সাহিত্যের অন্য কাহিনিতে বিষের ব্যবহারে মৃত্যু হয়নি। অন্য ধারার গল্পেও বিষ-প্রয়োগে মৃত্যুর উদাহরণ আছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে।

আসুন করোনা-আক্রান্ত এই সংকট সময়ে আমরা যখন 'ভ্যাকসিন' নামক একটি নিয়ন্ত্রিত বিষের জন্য অপেক্ষা করছি তখন এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিই বাংলা রহস্য-সাহিত্যে বিষের প্রভাবে মৃত্যুর দাস্তানে।

গোয়েন্দা কাহিনিতে কেন এত বিষ প্রয়োগের ছড়াছড়ি তার এককথায় কোনো জবাব হয় না। অনেক কারণের মধ্যে একটা হতে পারে সকলের কাছেই বিষ পরিচিত এবং সহজে সংগ্রহ করা যায় এমন একটা উপাদান। বিষ ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো দক্ষতা রপ্ত করার প্রয়োজন পড়ে না, যেমনটা বন্দুক-পিস্তলের ক্ষেত্রে করতে হয়। বেশির ভাগ সময় বিষ দিয়ে খুন করতে চাইলে অপরাধীকে কাছাকাছি থাকতে হবে এমনটা নয়, তাই অপরাধ করে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। অপরাধী বিষ

নির্বাচন ও তার ব্যবহারে যত নতুনত্ব আনতে পারে ততই জটিল হয়ে ওঠে সনাক্ত করার কাজ। হয়তো এই রকম এক বা একাধিক কারণের জন্যই গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা প্লট হিসেবে বারে বারে বেছে নেন বিষ প্রয়োগের অনুষঙ্গ।

গোয়েন্দা কাহিনিকে অনেকে তুলনা করেছেন দাবা খেলার সঙ্গে। আসলে বিষয়টাকে সেইভাবে দেখলে ভুল হবে। অপরাধী বনাম গোয়েন্দার লড়াইতে জয় সব সময় গোয়েন্দাই হাসিল করে। অর্থাৎ খেলাটা পূর্ব নির্ধারিত বা একপেশে। যত ধুরন্ধর বা কৌশলী একজন অপরাধী হোক-না কেন হার তাকে শেষে মানতেই হয়। গোয়েন্দা কাহিনির নিজস্ব যুক্তিতে অপরাধীকে জয়যুক্ত ঘোষণা করলে সামাজিক ন্যায় বিচারের কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। তিলে-তিলে একজন গোয়েন্দার ভাবমূর্তি এমন ভাবে গড়ে তোলা হয় যেন সে একাধারে আইনের রক্ষক তথা রাষ্ট্রের প্রতিভূ। গোয়েন্দার এই চিত্রকল্পটি সম্পর্কে যদি আমরা ওয়াকিবহাল হই তাহলে বুঝতে কোনো সমস্যাই থাকে না কোন্ ধরনের অপরাধের সে সমাধান করবে আর কোন্ ধরনের অপরাধ থেকে সে বজায় রাখবে দূরত্ব।

২০১৬-তে কেমব্রিজ ইউনির্ভাসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ডেভিড আর্নল্ডের *Toxic Histories : Poison and Pollution in Modern India*। বইয়ের আলোচ্য ভারতের বিষের ইতিহাস। ভারতীয় সমাজে বিষের নানা ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আর্নল্ড কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনেছেন। খাদ্যশস্যে কীটনাশকের ব্যবহার আর তার বিষময় ফল, পানীয় জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি এমনকি বাদ পড়েনি ভূপাল গ্যাস

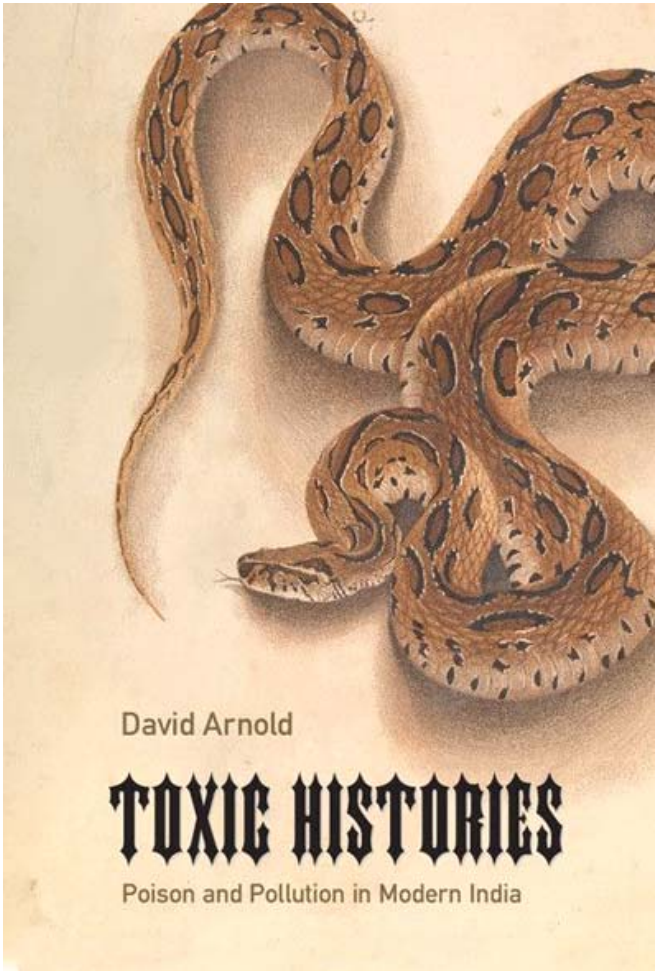
David Arnold
TOXIC HISTORIES
Poison and Pollution in Modern India

'দুর্ঘটনা'-র কথা। এসবই তিনি হাজির করেছেন বিষ প্রয়োগের ব্যাপক উদাহরণ হিসেবে। কাদের সর্বগ্রাসী লোভ আর সরাসরি মদতে এইসব কারবার ঘটে চলেছে সে বিষয়ে উপমহাদেশের বাসিন্দা হিসেবে আমরা কম বেশি ওয়াকেফ। ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত রাতারাতি এই দেশ ছেড়ে লম্বা দেয়। আমরা সব দেখেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হই, কারণ সবই নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্র পরিচালকদের অঙ্গুলি হেলনে। এই সব অপরাধ যতই জটিল আর গুরুতর হোক-না কেন তাদের ঠাঁই হয় না কোনো গোয়েন্দা কাহিনিতে। কারণ একজন ব্যক্তি গোয়েন্দা তথাকথিত কর্পোরেট ক্রাইমের সমাধান করতে অক্ষম। অপরাধ হিসেবে বিষ ব্যবহারের আলোচনায় কাহিনিতে তাই বেছে নেওয়া হয় এক বা একাধিক ব্যক্তিকে যাকে বা যাদের খুঁজে-পেতে শাস্তি দেওয়াটা সহজ।

প্লট হিসেবে বিষের ব্যবহারে এখনো যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই ইংরেজ লেখিকা আগাথা ক্রিস্টির চোদ্দোটি গোয়েন্দা কাহিনিতে বিষপ্রয়োগের বৈচিত্র্য নিয়ে ২০১৫-তে ক্যাথরিন হারকাপ লিখেছেন *A is for Arsenic : The Poisons of Agatha Christie*। ক্রিস্টির লেখা যেমন নানা সময়ে বাঙালি গোয়েন্দা কাহিনির লেখকদের প্রভাবিত করেছে তেমন আবার শোনা যায় তাঁকেও আকৃষ্ট করেছিল ভারতে অ্যাকোনাইট, ধুতরো আর আফিমের বিষাক্ত ব্যবহার। আর্নল্ড ও ক্রিস্টি দুজনেই তাঁদের নিজস্ব ঢঙে ধুতরোর কথা বলেছেন। ধুতরো আর আফিম ভারতে অত্যন্ত সহজলভ্য দু-টি উপকরণ যা একটু মেহনত করলেই হস্তগত করা যায়। এগুলির ব্যবহার আর অপব্যবহারও লোকেদের অজানা

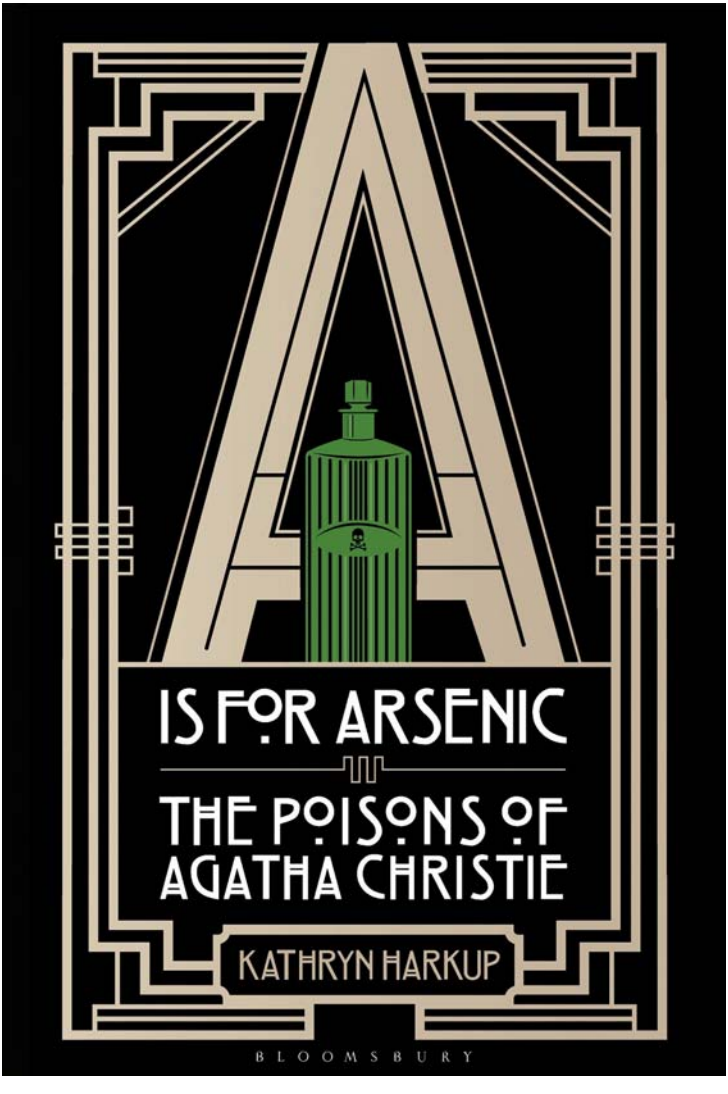
A
IS FOR ARSENIC
THE POISONS OF AGATHA CHRISTIE
KATHRYN HARKUP
BLOOMSBURY

নয়। আর্নল্ডের মতে একটা সময়ে কন্যাভ্রূণ হত্যায় ভারতীয় সমাজে ব্যাপক ব্যবহার ছিল ধুতরোর। ঠগি দমনকারী হিসেবে ইতিহাসখ্যাত মেজর স্লিম্যানের লেখাতেও উল্লেখ মেলে ঠগিদের ধুতরোর ব্যবহার। ফাঁসুড়ে হিসেবে ঠগিরা পরিচিত হলেও তাদের আরও বিশদ শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। ১৮৯৩-এ প্রকাশিত হয় *পুলিশ ও লোকরক্ষা* (ছাপা হয়েছিল ২০০০ কপি)। বইটিতে রামাক্ষয় জানাচ্ছেন, ঠগিদের ভিতরও নানা ভাগ ছিল যেমন, ফাঁসুড়ে, ধুতূরিয়া, মেঘপূণ্যা, মঘীয়া, খেকরী, করুই, ঠগভাট, প্রভৃতি। এদের মধ্যে ধুতূরিয়া ঠগিদের চরিত্র তিনি কিছুটা খোলসা করেছেন, "ধুতূরিয়া ঠগেরা ধুতূরা ও কুচলিয়ার (অভিধান মতে কুচিলা হল সাধারণ বন্যবৃক্ষ, লাল ও হরিদ্রাবর্ণ ফল হয়। ফল ঔষুধে ব্যবহৃত, পক্কল বিষক্রিয়াপদ Nux Vomica) বীজ প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য চূর্ণ নিকটে রাখে। পথিকদিগের সঙ্গে যাইতে যাইতে সুযোগ বুঝিয়া খাদ্য সামগ্রীতে এই চূর্ণ মিশাইয়া দেয়। কখন কখন পথক্লান্তি দূর হইবে বলিয়া আপনার সরবত সঙ্গে একপ্রকার নির্দ্দোষ চূর্ণ দিয়া তাহা পান করে কিন্তু পথিকদিগের সরবতে বা দুধে বিষাক্ত চূর্ণ মিলাইয়া দেয়। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে পথিকেরা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। যদি কোনো পথিক সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনর্জ্জীবিত হয় তবে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি জন্মের মত বিলুপ্ত বা বিকৃত হইয়া যায়।"

রামাক্ষয় ধুতূরিয়া ঠগিদের যে-কর্মপদ্ধতির কথা বলেছিলেন হুবহু তেমনই একটা ঘটনার উল্লেখ মেলে আর্দালি পাঁচকড়ি খানের জবানিতে (*The Revelations of an Orderly*, প্রকাশকাল ১৮৪৯)। সেই ঘটনার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে তুলে দেওয়া

পুলিস ও লোকরক্ষা

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

সংকলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১০৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

ইণ্ডিয়ান প্রেস্ট্রীট-যন্ত্রে শ্রীনবীনচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

খ্রীঃ ডিসেম্বর, ১৮৯২।

গেল: "একবার খবর মিলল, চারজন মুসাফিরকে জহর খাইয়ে লুঠ করা হয়েছে। এদের ভিতর মৌত হয়েছে দু'জনের আর বাকি দু'জন জিন্দা। তারা নাকি বহু কোশ চলার পর এক বিশাল পিপুল গাছের তলায় এসে থামে। কাছেই ছিল এক মিঠা পানির তলাব। ঠিক হয় সেখানে জিরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি দুপুরের খানাটাও খাওয়া হবে। খানা বলতে তো খানিকটা চৌবেনা। এই গাছতলাতেই আরাম করছিল আরেক দল মুসাফির। তাদের খানার ওই হাল দেখে তারা কিছুটা ছাতু দিতে চাইল আর ছাতু খেয়েই সবাই বেহুঁশ। তাদের গাঁঠরিতে ছিল হরেক কিসিমের চাঁদির জেবারত যেমন চুড়ি, পঁইছা, ইত্যাদি সবই ওই খাবিশেরা লুঠ করেছে।"

পাঁচকড়ি লিখেছেন বেশিরভাগ সময়, সিভিল সার্জেন সুরতহালের পর স্রেফ এইটুকুই বলতে পারতেন: "মনে হচ্ছে এদের ধুতরোর মতো কোনও জহর খাওয়ানো হয়েছিল। লাশের গায়ে কোনও চোটের নিশান নেই।" গুনিন, পির, ওঝা, তন্ত্র-মন্ত্র-ঝাঁড়ফুক ভারতীয় সমাজ জীবনের এক আবশ্যিক অঙ্গ। সেখানে দেব-দ্বিজের নামে হামেশাই ইস্তেমাল করা হয় নেশার বস্তু আর বিষ। কী গ্রামে, কী শহরে মানুষ তাই এই বিষের ব্যবহার সম্পর্কে কম বেশি হিকমতি। এই বক্তব্যের সমর্থনে আমরা বলতে পারি বিষ দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত ত্রৈলোক্যতারিণীর জবানবন্দির কথা যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর *শেষলীলা* বইটিতে (*দারোগার দপ্তর* ৭৮তম সংখ্যা, প্রকাশকাল ১৩০৫ বঙ্গাব্দ। ছাপা হয় ২৫০০কপি।)। ত্রৈলোক্য জানায়, "[...] আমার

8023 aa 21

THE

REVELATIONS

OF

AN ORDERLY.

BY

PAUNCHKOUREE KHAN.

BEING AN ATTEMPT TO EXPOSE THE ABUSES OF ADMINISTRATION BY THE RELATION OF EVERY-DAY OCCURRENCES IN THE MOFUSSIL COURTS.

BENARES:
PRINTED AND PUBLISHED BY E. J. LAZARUS & CO.,
AND SOLD BY
TRÜBNER AND CO., PATERNOSTER ROW, LONDON
AND ALL BOOKSELLERS.

1866.

TRÜBNER & CO.,
60, *Paternoster Row*,
LONDON.

পূর্ব বাসস্থান ছিল পাড়াগাঁয়ে। সুতরাং ধুতুরা যে কি জিনিষ তাহা আমি বেশ জানি। উহার গুণ আমি অবগত আছি এবং কোথায় যে উহা পাওয়া যায়, তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই।"

বিষ খাইয়ে খুন করার মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা উত্তেজনা তাই ছিল না যতক্ষণ-না তা সাধারণের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বড়ো লোকেদের আঙিনায় প্রবেশ করল। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, পারিবারিক কেচ্ছা, মৃত্যু ঘিরে রহস্য, আদালতে দিনের পর দিন ধরে চলা সওয়াল জবাব আর সর্বোপরি সংবাদপত্রের গরমাগরম প্রতিবেদন বিষ খাইয়ে হত্যাকে পৌঁছে দিল এক নতুন উচ্চতায়। আর্নল্ড উল্লেখ করেছেন ১৮৭৪-এ বরোদার ইংরেজ রেসিডেন্ট পলিটিক্যাল অবজ়ার্ভার রবার্ট ফেরি গাইকোয়াডের খিলাফ তাকে বিষ খাইয়ে খুন করার অভিযোগ আনেন। তবে তার থেকেও আমাদের অনেক কাছের একটি ঘটনার বিবরণ মেলে চিত্ত পান্ডার *The Decline of the Bengal Zamindars: Midnapore 1870 -1920* বইটিতে।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের জমিদার ছিলেন, রুদ্রনারায়ণ রায়। তিনি তাঁর পিতার প্রথম পক্ষের সন্তান। বিমাতা কৃষ্ণপ্রিয়ার দুই পুত্র। জমিদার নরনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণেরই জমিদার হওয়ার কথা। কিন্তু গোল বাধল কৃষ্ণপ্রিয়া সরকারের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ জানানোয়। তাঁর আবেদন মোতাবেক রুদ্রনারায়ণকে কিছুতেই জমিদারের স্বীকৃতি দেওয়া চলে না কারণ সে কৃষ্ণপ্রিয়া ও তাঁর দুই সন্তানের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে। এই আবেদন অবশ্য আমল পায় না।

DETECTIVE STORIES No. 78. দারোগার দপ্তর ৭৮ম সংখ্যা।

শেষ লীলা।

(অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয়!)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

All Rights Reserved.

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [আশ্বিন।

আইনি পথে ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া নেমে পড়লেন পারিবারিক চক্রান্তে। ১৮৩৩-এ রুদ্রনারায়ণকে বিষ খাইয়ে খুন করার চেষ্টা হল। আপাতদৃষ্টিতে মৃত রুদ্রনারায়ণকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে দাহ করতে। সেইসময় শুরু তুমুল ঝড়বৃষ্টি। দাহকারীরা মৃতদেহটিকে শ্মশানে ফেলে রেখেই ছুট দিল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। শ্মশানের কাছেই সেই সময় ডেরা বেঁধেছিল দুজন সন্ন্যাসী। সৌভাগ্যক্রমে তাদের নজরে পড়ে সেই দেহটি। তারা লক্ষ করে মৃত বলে যাকে দাহ করতে আনা হয়েছে আসলে সে জীবিত। সাধুদের পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ওঠে রুদ্রনারায়ণ। স্মৃতি ফিরে এলে তার বুঝতে অসুবিধে হয় না এই অবস্থায় তখুনি সংসারে ফিরে যাওয়াটা খুব নিরাপদ হবে না। সাধুদের সঙ্গে তাই সে বেরিয়ে পড়ে উত্তর ভারত পরিভ্রমণে। সন্তানেরা নাবালক বলে কোম্পানি জমিদারি সামলানোর ভার ইতিমধ্যে তুলে দেয় কৃষ্ণপ্রিয়ার হাতে।

দুই বছর পর রুদ্রনারায়ণ ফিরে এলে জেলার হাকিমের কাছে আবেদন করা হয় তাকে জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার। তবে কৃষ্ণপ্রিয়ার পালটা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হতে হয় বিতর্কিত রুদ্রনারায়ণকে। শুরু হয় দুই পক্ষের আইনি লড়াই। প্রথমে মেদিনীপুর সদর আমিন আদালতে যেখানে খারিজ হয় রুদ্রনারায়ণের আবেদন তারপর কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালত। বিচারক এ জে মিলস শুনানির পর বহাল রাখেন নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তই।

হুবহু যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে ৭৫ বছর পর ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায়। দার্জিলিং শহরে অসুস্থ ভাওয়ালের

দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রকে আর্সেনিক খাওয়ানো হয়েছিল কিনা তাই নিয়ে আদালতে নানা সংশয় থাকলেও দুই জায়গায় আর দুই সময়ের আখ্যান দু-টিতে মিল লক্ষ করার মতো। স্রেফ বাংলাতেই যে এমন ঘটনা বার-বার ঘটেছে এমনটা ভাবলে ভুল হবে। উত্তর ভারতেও জানা যায় সমগোত্রের আরো একটি ঘটনার কথা। 'প্রবাসী' পত্রিকাতে শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৈশাখ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমরা হুবহু সেটি এখানে তুলে দিলাম:

ল্যাণ্ডোরার জাল রাজা

বিলাতে টিচবোর্ণ মোকদ্দমার বিষয় হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু এদেশে যে একটি সেইরূপ মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের জানা নাই। আজ এই ভারতীয় মোকদ্দমাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রান্তে হরিদ্বারের সন্নিকট ল্যাণ্ডোরা রাজ্য স্থিত। এ রাজ্য বেশী বড় নহে, কিন্তু অনেক সাধারণ জমিদারী বা তালুক অপেক্ষা বড়। একশত বৎসরেরও অধিক হইল রামদয়াল সিংহ নামক এক গুজর যুবক এই রাজ্য সংস্থাপিত করেন। পশ্চিম দেশে গুজর একটি criminal tribe অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মজীবী জাতি। তাহাদের ব্যবসা চুরি ডাকাতি করা । রাম দয়ালের পিতা ও প্রপিতামহ শুনা যায় ভাল-মন্দ উপায়ে কিঞ্চিৎ জমিদারী করিয়াছিলেন, কিন্তু রামদয়ালই প্রথম রাজা হইয়া বসেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যান। কথিত

আছে যে তিনি হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থের পথে কতকগুলি পান্থনিবাস সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং যাত্রীদিগকে বিশেষ সৎকারের সহিত সেখানে রাখিতেন। কিন্তু সিংহের গুহার ভিতরে অনেক জীব যায়, বাহিরে বড় আর ফিরে না। সেইরূপ সেই যাত্রীরা সে বাটী আর বড় ছাড়িতে পারিত না। রাত্রে সর্বস্বান্ত হইয়া যদি প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিত, তাহা হইলে সে শুদ্ধ অদৃষ্টের বলে। এ সকল কিম্বদন্তি কতদূর ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, আমি তদ্বিষয়ে কোন স্থির মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, এক শতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশে নানারূপ অত্যাচার সংঘটিত হইত, এবং. আধুনিক অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদারের ঐশ্বর্য নরকঙ্কালরূপ ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে। রাজা রামদয়ালের বিষয় যে সম্পূর্ণ সদুপায়ে উপার্জিত হয় নাই, লোকে তাহার আরও এই এক প্রমাণ দেখাইয়া থাকে যে, রামদয়ালের পর কোন রাজা এ বিষয় বড় ভোগ করিতে পারেন নাই, এবং এখন এ রাজবংশ প্রায় লোপ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এ বংশে চিরকাল রাণীদের প্রাদুর্ভাব, কুমারেরা বেশী দিন বাঁচেন না। রামদয়াল সিংহ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে কুশল সিংহ নামক এক অতি শিশুসন্তান রাখিয়া যান। রাজা কুশল সিংহের আবার সাবালক হইতে না হইতেই প্রাণ বিয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ইনি পরে রাজা হরিবংশ সিংহ নামে পরিচিত হন, কিন্তু ইনিও বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাখিয়া যান এক স্ত্রী-রাণী কমলাকুয়র ["কুয়র" কথাটি পশ্চিমে মেয়েদের নামের অন্তে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। ইহা

কি "কুমারী"র অপভ্রংশ?] এবং এক শিশু সন্তান কুমার রঘুবীর সিংহ। সে পঞ্চাশ বৎসরের উপরের কথা। এই কুমারও অষ্টাদশ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অত্যল্পকাল পরেই কালকবলে পতিত হন। শুনা যায় ইহাঁর সহধর্ম্মিণী রাণী ধর্ম্মকুয়র স্বামীর মৃত্যুর মাস আষ্টেক পরে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু সেই বালক এক বৎসরের মধ্যেই মারা যায়। মোটের উপর রাজা রঘুবীর সিংহকেই ল্যাণ্ডোরার শেষ রাজা বলা যাইতে পারে। ৩৪ বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাণী ধর্ম্ম-কুয়রের বয়স তখন অল্প ছিল বলিয়া রাণী কমলাকুয়রই সমস্ত বিষয়ের ভারগ্রহণ করেন। তিনি বড় তীক্ষবুদ্ধি স্ত্রীলোক ছিলেন, এবং তাহার চেষ্টায় বধূরাণী ধর্ম্মকুয়র কয়েকবার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু পোষ্যপুত্র একটিও বাঁচিল না। পরে বড় রাণী অর্থাৎ কমলাকুয়র স্বয়ং ৭।৮ বৎসর হইল, জীবলীলা সম্বরণ করেন। রাণী ধর্ম্মকুয়র ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বলবন্ত সিংহ নামক একটি বালককে শেষ দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাণীর সহিত কলহ করিয়া বসিয়াছিলেন। আদালতে বিরাট সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সে মোকদ্দমার জের এখনও মিটে নাই। রাণীর এখন বয়সও হইয়াছে, তাহার অনেক নিন্দাবাদও অনেক লোকে করিয়া থাকে। ল্যাণ্ডোরারাজ বোধ হয় এইবার উৎসন্ন যাইবে। লোকে ঠিকই বলে যে, অধর্ম্মের কড়ি কেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না।

আমি উপরে বলিয়াছি যে, রাজা রঘুবীর সিংহকেই ল্যাণ্ডোরার শেষ রাজা ধরা যাইতে পারে। ভারতীয় টিচবোর্ণ মোকদ্দমা ইহাকে লইয়াই হইয়াছিল। সেই জন্য ইহার জীবনীই আমাদের আলোচ্য।

রাজা রঘুবীর সিংহ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইহার মাতা রাণী কমলাকুয়র এবং মাতুল পধান সাহেব সিংহ [গুজরদিগের মধ্যে পধান একটি মান্যের উপাধি, "প্রধান"এর অপভ্রংশ।] ইহাকে মানুষ করেন। ইনি বাল্যাবস্থায় বাড়ীতেই কিছু উর্দু, শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার শ্রীমতী ধর্ম্মকুয়রের সহিত বিবাহ হয়। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি নাবালকদের স্কুলে (Wards Institute) অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশী প্রেরিত হন। সেখানে তিনি প্রায় ২৷৷০ বৎসর ছিলেন। মধ্যে কেবল একবার বধূর 'গৌণা' বা দ্বিরাগমনের জন্য ল্যাণ্ডোরায় আসিয়াছিলেন। পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তিনি সাবালক হইয়া স্কুল ছাড়িয়া ল্যাণ্ডোরায় প্রত্যাগমন করেন। সে সময় তাহার মাতা রাণী কমলাকুয়র স্বীয় ভ্রাতা রাও সাহেব সিংহের সাহায্যে রাজকার্য্য অতিবাহিত করিতেন। রঘুবীর সিংহ কাশী হইতে আসিয়া সেই কার্য্যের কিঞ্চিৎ ভার লইলেন। কিন্তু জগদীশ্বর তাহার অদৃষ্টে বেশীদিন রাজসুখ লিখেন নাই। দুই বৎসরের মধ্যে তাহাকে কাল যক্ষ্মায় আক্রমণ করিল এবং মাস কতক কষ্ট পাইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

এই ত রাজা রঘুবীর সিংহের জীবনের যথার্থ ইতিহাস। আমরা সকলেই কিন্তু জানি যে, বড়ঘরে কেহ এরূপ অল্পবয়সে অল্পদিন ভুগিয়া মরিলে কেমন পাঁচটা কথা উঠে। এস্থলেও তাহাই হইল। লোকে নানারূপ কথা বলিল, সদরে হাকীমদের কাছেও দু'চারখানা দরখাস্ত পড়িল যে, ইহার ভিতর কিছু গোল আছে, হয়

ত বিষ খাওয়ান হইয়াছিল, তদন্ত করা হউক। কলেক্টর ও ডাক্তার সাহেব কিছু তদন্তও করিলেন, কিন্তু অনুসন্ধানে কিছু বাহির হইল না। পরে রাণী ধর্ম্মকুয়রের একটি পুত্রসন্তানও জন্মিল, সরকারি কাগজপত্রে তার নামও চড়িল, কিছুদিন পরে সে মরিয়াও গেল। তখন দুই রাণীতে মিলিয়া বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ৫।৬ বৎসর কাটিয়া গেল, ছোট রাণী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন, সেটিও বিনষ্ট হইল। এমত সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন একজন ফকীরবেশধারী লোক রুর্কীর অন্তঃপাতী মংলৌর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে রাজা রঘুবীর সিংহ বলিয়া প্রকাশ করিল। তাহার মস্ত দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র। সে বলিল যে তাহাকে মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু সে মরে নাই, ভগবৎপ্রসাদে রক্ষা পাইয়াছে, এবং নিজের স্বত্ব দাবী করিতে আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকে একটা হলুস্থূল পড়িয়া গেল; ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সহরে শান্তি রক্ষা করা দায় হইয়া পড়িল। সেই ফকীরকে প্রথম অজ্ঞাতনিবাস বদমাইশ্ বলিয়া গেরেফতার করা হইল। হাকীমদিগের ধারণা হইল যে, লোকটা জুয়াচোর। তাহার উপর পুলিশে কয়েকটা ফৌজদারী মোকদ্দমা খাড়া করিয়া ফেলিল। শেষে চতুর্দ্দিকে নানারূপ, গোলযোগ হওয়ায় হাইকোর্টের হুকুমে এই মামলার বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য জয়েন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মারর্খ্যাম্ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া সাহারণপুরে পাঠান হইল। তাঁহার সমক্ষে রীতিমত ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিল, এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া মারর্খ্যাম্ সাহেব বিচার করিলেন যে, ঐ ফকীরবেশধারী পুরুষটি পঞ্জাবী, তাহার যথার্থ নাম মহাসিংহ এবং তাহার পিতার নাম

কানসিংহ রামদাসী, তাহাদের নিবাস হোশিয়ারপুর-অন্তঃপাতী খেড়া মহালপুর গ্রামে। ফলতঃ ঐ জালরাজার প্রতি ভারতের দণ্ডবিধি আইনের ৪১৯ ধারা অনুসারে প্রতারণা অপরাধে (cheating by false personation) সশ্রম কারাবাসের অনুজ্ঞা হইল, এবং এই হুকুম আপীলেও বাহাল রহিল।

ফকীর কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে জেল হইতেই সাহারণপুর দেওয়ানি আদালতে দাবী করিয়া বসিল। ফৌজদারী আদালতের বিচারে স্বত্ব নির্ণয় হয় না। রুর্কী ও সাহারণপুর অঞ্চলে সাধারণ লোকের মন এই অসাধারণ মামলা লইয়া বড়ই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য হাইকোর্ট এই দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার অন্য জেলায় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া উহা মিরটে জজের আদালতে পাঠাইয়া দিলেন। এই দাবী কিন্তু কিছু আইনসম্পৃক্ত দোষের দরুণ খারিজ হইয়া গেল, তখন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সেই ফকীর মিরটে সব্-জজের আদালতে মুফলিস্ (pauper) হইয়া দাবী করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তা গ্রাহ্য হইল না। পরন্তু তাহার অদ্ভুত-কাহিনী শুনিয়া অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অনেক চতুরবুদ্ধি লোক যে ভাবীলাভের আশায় প্রচুর অর্থ লইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রদেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি রাজা রঘুবীর সিংহের নামে পুরাষ্ট্যাম্প্ লাগাইয়া মিরটে সব্-জজের আদালতে নালিশ রুজু হইল। প্রতিবাদিনী হইলেন দুই রাণী—কমলাকুয়র ও ধর্ম্মকুয়র। দাবী—সমস্ত তালুকার দখল পাইবার। এই মোকদ্দমার বিচার করিলেন, স্বনামখ্যাত সব্-জজ কাশীনাথ বিশ্বাস রায় বাহাদুর।

প্রায় দেড় বৎসরকাল ধরিয়া তাঁহার কোর্টে মোকদ্দমা চলিল, দুই পক্ষই এলাহাবাদ হইতে বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার লইয়া গেল, অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিত হইল। পরে এই মোকদ্দমার অদ্ভুত বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিয়া উর্দ্দু ভাষায় একখানি ৩০০।৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এখানে বাদীর সাক্ষ্যের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিব।

সে অবশ্য রাজা রঘুবীর সিংহ বলিয়া নিজের পরিচয় দেয় এবং বলে যে, তাহার মা ও মামার চক্রান্তে পড়িয়া সে প্রায় প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিল। সে বারাণসী হইতে ল্যাণ্ডোরায় প্রত্যাগমন করিলে দেখিল যে, তাহার মাতা রাণী কমলাকুয়রের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে এবং তাহার মাতুল এই অবৈধ প্রেমের প্রবর্ত্তক। সে স্বীয় মাতার সহিত এই বিষয় লইয়া একটা তুমুল কলহ করিল, এবং পুত্রের এই আচরণে রাণী কমলাকুয়র এবং তাঁহার ভ্রাতা পধান সাহেব সিংহ দুই জনেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর হইতে রাজপ্রাসাদে মনান্তর এবং বিবাদ প্রবেশ করিল। রাজা রঘুবীর সিংহ অনেক দিন প্রবাসের পর বাড়ী আসিয়াছেন, তখনও বালক, নিজের মা ও মামার সহিত কি করিয়া যুঝিয়া উঠিবেন? তাহারা সুবিধা খুঁজিতেছিল, শীঘ্র সুবিধাও জুটিল। রঘুবীর সিংহ পীড়িত হইলেন। তখন তাহার শত্রুরা তাঁহাকে একদিন ঔষধের সহিত কি খাওয়াইয়া দিল। তাহা খাইয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে হরিদ্বারের সন্নিকটস্থ কঙ্খলধামে গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তাড়াতাড়িতে দগ্ধ করা হয় নাই, তাই মরেন নাই। ১০।১২ ঘণ্টা নদীর জলে ভাসিতে থাকেন, কিন্তু ডুবেন নাই। পরদিন প্রাতে গোমানি নামক এক রজক

গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় এবং আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করে। তখন রাজার অল্প জ্ঞান হইয়াছে। যখন তাঁহাকে পাড়ে টানিয়া তোলা হইল, তখন তিনি ইঙ্গিতে একটু জল খাইতে চাহিলেন। মহুয়া গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া ঠোঙ্গা তৈয়ার করিয়া ধোপা তাহাকে জল খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জল মুখের ভিতর গেল না, পাশ বাহিয়া পড়িয়া গেল। তখন গোমানি দেখিল যে, রাজার মুখের মধ্যে তুলা ঠাসা রহিয়াছে। সে তুলা বাহির করিয়া ফেলিল এবং পরে রাজাকে জল খাওয়াইল। এহেন সময়ে এক গোসাঁই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ,—মিশ্র। তাঁহার হস্তে রাজাকে সমর্পণ করিয়া রজক অন্তর্হিত হইল। যাইবার সময় কিন্তু রাজা তাহার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। পরে সেই গোসাঁই রাজাকে নিজ কুটীরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। কণ্ঠদেশের একস্থান চিরিয়া শরীরস্থ বিষ বাহির করিয়া দিলেন। এই কাটা-ঘা নালিশের সময় পর্যন্ত শুকায় নাই। রাজা সুস্থ হইয়া গোসাঁইজীর নিকটে রহিলেন। একদিন দেখেন যে ল্যাণ্ডোরার একটি সওয়ার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। রাজা কুটীরের মধ্যে লুকাইলেন ; সওয়ার গোসাঁইজীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেল। তখন রাজা গোসাঁইকে বলিলেন যে, ঐ সওয়ার বোধ হয় তাহাকেই অন্বেষণ করিতেছে। গোসাঁই এই কথা শুনিয়া রাজার হাত দেখিলেন এবং গণিয়া বলিলেন যে, সম্মুখে ৭৷৷০ বৎসর রাজার সময় বড় খারাপ, গ্রহেরা বিমুখ, এই সময়টা আত্ম-পরিচয় না দেওয়াই ভাল, ছদ্মবেশে কাটান উচিত। রাজা গোসাঁইজীর পরামর্শ অনুসারে গোপনে দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। মাসেক

দু'মাস হরিদ্বারের সন্নিকট ধারাপুর, হৃষীকেশ এবং শিববনে ঘুরিলেন, তাহার পর আরও উত্তরের দিকে গেলেন। ২৷৷০ বৎসর কাল টিহরি, সফেদমণ্ডি এবং অমৃতসরে কাটিল। তাহার পর পাটিয়ালার মহারাজার রাজ্যে প্রায় ২৷৷০ বৎসর পর্য্যটন করিলেন। এই সময় ফরিদকোট ও নাভা দেখিলেন। অবশেষে হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিয়া নীলধারার তটস্থ এক বৈরাগীর আশ্রমে রহিলেন। এই সময়ে তিনি গুরু শিবরামপুরীর দ্বারা দীক্ষিত হন, এবং শুদ্ধ গ্রহদোষ কাটাইবার জন্য আত্মপ্রকাশ করেন নাই।

বাদী এইরূপ একটি অতীব আশ্চর্য্য কাহিনী আদালতের সমক্ষে প্রচার করে। তাহাকে সুদীর্ঘ জেরা করা হয়, এবং সে ল্যাণ্ডোরাপ্রাসাদের কথা, রাণী কমলাকুয়রের কথা, রাণীধর্ম্মকুয়রের কথা নানারূপ ব্যক্ত করে। এমন কি, ছোট রাণীর শরীরের কোন্ অংশে তিল কিম্বা ক্ষতের দাগ আছে, তাহা পর্য্যন্ত প্রকাশ করে। অনেক লোক আসিয়া বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বলে, "এই রাজা রঘুবীর সিং, ইহাকে আমরা চিনিতে পারিয়াছি।" এই সাক্ষীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাণী ধর্ম্মকুয়রের দুই পিশী এবং কাশীর নাবালক স্কুলের (Wards' Institute) ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীকেদারনাথ রায় চৌধুরী। প্রতিবাদিনীদের পক্ষ হইতে অনেক সুসভ্রান্ত লোক সাক্ষ্যপ্রদান করেন এবং একবাক্যে বলেন যে, বাদীর চেহারা, কথাবার্ত্তা এবং রকমসকমে প্রকাশ যে, সে রাজা রঘুবীর সিংহ নহে,—একটা জালিয়াৎ জুয়াচোর। এস্থলে বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে, রাণী কমলাকুয়র ও রাণী ধর্ম্মকুয়র বাদীকে বেশ ভাল করিয়া

ঠাহর করিয়া দেখিয়া শপথ করেন যে, সে কখনই রাজা রঘুবীর সিংহ নহে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে সব্-জজ শ্রীকাশীনাথ বিশ্বাস মহাশয় তাহার রায় প্রচার করেন। তাঁহার ফয়সলাটিকে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক বলিলেও চলিতে পারে। সব্-জজ বাহাদুর মোকদ্দমার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন যে, বাদীর কাহিনী যে শুদ্ধ বিস্ময়কর ও কল্পিত তাহা নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তিনি দাবী নামঞ্জুর করেন। বাদী হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত আদালতের মাননীয় বিচারপতিরা কাশী বাবুর সহিত একমত হয়েন, আপীল খারিজ হয়। এইখানে ল্যাণ্ডোরার জাল-রাজার মোকদ্দমার ইতি।

পাঠক দেখিবেন যে এরূপ বিশাল জালচক্রের কণা পৃথিবীতে খুব কমই শুনিতে পাওয়া যায়। এই ল্যাণ্ডোরার মোকদ্দমা যে কতকগুলি খুব চতুর লোকে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড তালুক আপনাদের করতলগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারই অনতি পূর্ব্বে ইংলণ্ডে টিচ্‌বোর্ণ মোকদ্দমা হয়, এবং বোধ হয় ঐ বিখ্যাত বিলাতি জুয়াচুরির কথা শুনিয়াই আমাদের ভারতীয় জুয়াচোরদিগের মাথায় একটা নুতন বুদ্ধি প্রবেশ করে। সৌভাগ্যক্রমে হাকীম অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার প্রখরদৃষ্টি প্রতারণার জাল ভেদ করিয়া ফেলে। তবে এস্থানে বলা আবশ্যক যে, টিচ্‌বোর্ণ মোকদ্দমার জুরী সম্ভাষণকারী প্রধান বিচারপতি কোব্‌রণ (Cockburn) যে অসামান্য প্রতিভাব্যঞ্জক বক্তৃতা করেন, তাহা পাঠ করিয়া কাশী বাবু অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে রাজ্যলুট করিবার

প্রয়াস দুইবার হইয়াছে;—একবার বর্দ্ধমানে জাল-প্রতাপচাঁদের দ্বারা, এবং আর একবার ল্যাণ্ডোরায় জাল-রঘুবীর সিংহের দ্বারা। আশা করা যায়, দুইবারই সত্যের জয় হইয়াছে।

ঘটনাগুলির এত ফাঁদালো এলানের পর যে সওয়াল ওঠা জায়েজ় তা হল বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে কি বাস্তবের এই ঘটনাগুলির কোনো সরাসরি ছাপ পড়েছিল? যে সময় মামলাগুলি আদালতে চলেছিল নিঃসন্দেহে তখন আলোড়ন কিছু কম হয়নি। একে মৃত্যু ঘিরে রহস্য, মৃতের প্রত্যাবর্তন, বিষ খাইয়ে খুন করার চেষ্টা তার উপর জমিদার বাড়ির অভ্যন্তরীণ কেচ্ছা—নাটকীয়তার কোনো ঘাটতি ছিল না। প্লট হিসেবে গোয়েন্দা কাহিনি লেখার জন্য একেবারে মানানসই। তবুও দেখা যাবে এই ঘটনাগুলিকে নিয়ে সেই অর্থে কোনো গোয়েন্দা কাহিনি লেখা হয়নি। কেন? কারণ হিসেবে দু-টো অনুমানের কথা বলা যায়। এক মামলা চলাকালীন পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, মায় পাঁচালি কোনো কিছুরই খামতি ছিল না। ঘটনাগুলির পক্ষে-বিপক্ষে এত বেশি লেখালেখি হয়েছিল যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা এড়াতে গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা মনে হয় হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। সরাসরি না-হলেও পরোক্ষভাবে যে-গোয়েন্দা কাহিনিতে ঘটনাগুলির প্রভাব পড়েনি সে কথা বলা যাবে না। নিচু তলার সমাজে বিষ দিয়ে খুন করার হাজারো নজির থাকলেও গল্পের প্লট হিসেবে জনপ্রিয় হয় রাজা-মহারাজা-জমিদার নিদেন পক্ষে বড়ো ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিষ প্রয়োগে হত্যা। খুন যদি হতেই হয় তবে তা হবে সমাজের কেষ্টবিষ্টুদের তবে না তার কিনারা করে

খ্যাতি বাড়বে গোয়েন্দার! মিলবে তারিফ। দ্বিতীয়ত বাস্তবে ঘটে যাওয়া কোনো চাঞ্চল্যকর অপরাধ নিয়ে গল্প ফাঁদার অন্য একটা বিপদ আছে। ঘটনা ও তার পরিণতি এতটাই জানা যে-রহস্য সৃষ্টি করা বেশ কঠিন। পাঠক সব সময় চাইবে আসল ঘটনার সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচার করতে।

বিষ ব্যবহার করে খুন করার যত ঘটনার কথা জানা যায় তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এক নম্বরে থাকবে ১৯৩৩-এর পাকুড় হত্যা মামলা। প্রয়োগের অভিনবত্বই বলুন আর বিষ ব্যবহারের নতুনত্বই বলুন পাকুড়ের ঘটনা ভারতের অপরাধ ইতিহাসে বেনজির। পাকুড় রাজ-পরিবারের সন্তান অমরেন্দ্রকে হাওড়া স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে কে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়। অমরেন্দ্র ট্রেনে চড়ার পর আবিষ্কার করে তার ডান হাতের কনুইয়ের উপর এক ফোঁটা রক্ত আর সেইসঙ্গে কেমন একটা তেল-তেলে জিনিস। এর কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। পরে এই মৃত্যু ঘিরে তদন্ত শুরু হলে জানা যায়, সৎ ভাই বিনয়েন্দ্রের চক্রান্তে তার শরীরে বিউবনিক প্লেগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫১-৫২-তে বাস্তবে ঘটে যাওয়া এই অপরাধকে ভিত্তি করে নীহাররঞ্জন গুপ্ত লেখেন *মৃত্যুবাণ*। আগেই বলা হয়েছে বাস্তবের রহস্যকে ছাপার অক্ষরে সমান মুনাসিব করে তোলাটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ক্যারিশ্মেটিক গোয়েন্দা কিরীটি রায়ের উপস্থিতিও তাই কাহিনিটিকে সেইভাবে সফল করে তুলতে ব্যর্থ।

পাকুড় হত্যার অভিনবত্ব যে গোয়েন্দা গল্পের লেখকরা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলেন এমনটা নয়। ওই ঘটনার ছাপ লক্ষ করা যায় কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বামীজি আর অনুকূল

বর্মা' গল্পে। এই গল্পে গোয়েন্দা অনুকূল বর্মাকে এমন একটি কেসে জড়িয়ে পড়তে হয় যেখানে সন্দেহের তির স্বামী সহজানন্দের দিকে। বারাসাতে পঞ্চাশ বিঘা জায়গা জুড়ে স্বামীজির বিরাট আখড়া। তার চেলারা প্রায় সবাই মহিলা আর তারা অর্থবানও বটে। সন্দেহ দেখা দেয় এক বছরের মধ্যে চারজন শিষ্যা মারা গেলে, যারা নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি স্বামীজিকে উইল করে দিয়ে গিয়েছিল। অনুকূল বর্মা ধরে ফেলেন স্বামীজির ভেকধারী অজয় গুপ্তই অপরাধী। বাকিটা শোনা যাক তাঁরই মুখ থেকে:

> [...] আশ্রমের মঠে নানা ভয়ঙ্কর রোগজীবাণু সে কালচার করত। উৎসবের দিনে ভক্তদের হাতে সামান্য ডোজে ভাং সে ইনজেক্ট করে দিত। তার ফলে ভক্তদের মনে একটা অদ্ভুত আনন্দের মোহ কিছুক্ষণের জন্য জন্মাতো। এই নেশার দরুন শিষ্য-শিষ্যারা তাকে ছেড়ে যেত না। কিন্তু তার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হল, ধনী বিধবা মহিলাদের মার্ডার করে তাদের বিষয় সম্পত্তি হাতানো। [...] তাদের মৃত্যু হত নিজেদের বাড়িতে। [...] ব্যাসিলাস কোলি ফিমিউনিস। সেটা ইনজেক্ট করলে কিছুক্ষণ পরে হয় আলসার আর কোলাইটিস টাইফয়েডের জীবাণু ইনজেক্ট করলে হয় টাইফয়েড। [...] ধনী মহিলাদের এইসব জীবাণু সে ইনজেক্ট করত। [...] শহরের নানা জায়গায় নিজেদের বাড়িতে মহিলারা মারা যেতেন। আলাদা আলাদা ডাক্তার তাঁদের চিকিৎসা করতেন। অজয় গুপ্তকে কে সন্দেহ করবে?

গোয়েন্দা সাহিত্য বাদেও এমন অনেক গল্পের হদিস মেলে যেখানে বিষ দিয়ে খুন করার অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। কেবল গোয়েন্দা হাজির নয় বলেই আমরা সেই গল্পগুলিকে গোয়েন্দা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করি না। ধরা যাক, জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম্' গল্পটির কথা। কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা ভালো রকম পণ

নিয়ে বিয়ে দেন তাঁর পুত্র ভূতনাথের। কিছুদিনের মধ্যেই ছেলের বউ জ্বরে পড়ে আর তার মৃত্যু হয়। আবারও ভূতনাথকে বাধ্য করা হয় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। সেই বউটিরও অন্তিম পরিণতি একই। তৃতীয়বার বিয়ে হলে সেয়ানা হয়ে ওঠে ভূতনাথ। তার নজরে সাফ হয়ে যায় কৃষ্ণকান্তের লোভ ও খুনের ছক। ফলে প্রাণে বাঁচে তার তৃতীয় স্ত্রী। লোভ-অপরাধ-বিষের ব্যবহার আর শেষে খুনির শনাক্তকরণ—গোয়েন্দা গল্পের সবকটি উপকরণই এখানে হাজির।

এই আলোচনার গভীরে না-গিয়ে সরাসরি বরং ঢোকা যাক বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে বিষের অনুষঙ্গে। এখানেও মিলবে এক ধরনের ভাগাভাগি। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যকে ভাগ করা হয় বয়স্কপাঠ্য আর কিশোরপাঠ্য এই দুই ধারায়। ভাগাভাগি ঠিক হয়েছে গল্পে ষড়রিপুর প্রথমটির উল্লেখ থাকা-না-থাকা দিয়ে। বাকি পাঁচটি রিপু নিয়ে কোনো নৈতিক অবস্থান নেই। এইরকম কোনো তরফদারির মধ্যে আমরা ঢুকতে চাই না। কাহিনিতে বিষ প্রয়োগের রকমফের আমাদের আলোচ্য। মৌলিক গল্প হিসেবে বিষের ব্যবহারের উল্লেখ মেলে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'তিলে তাল' গল্পে। পুণা অঞ্চলের বিখ্যাত ডাক্তার শঙ্কর নারায়ণ অভিযুক্ত হন গোবিন্দ রাও সিন্ধে নামে এক বড়ো জায়গিরদারকে বিষ দিয়ে খুন করার অভিযোগে। খোদ লেখকই এখানে গোয়েন্দা। তাঁর জবানিতে জানা যাচ্ছে, রোগীর অসুখ গুরুতর আকার ধারণ করলে তিনি নিজের হাতে ওষুধ তৈরি করে কর্মচারীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সেই ওষুধের এক দাগ খাওয়া মাত্র রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করতে

করতে প্রাণত্যাগ করে। ডাক্তার অকুস্থলে পৌঁছলে ওষুধের শিশি পরীক্ষা করে দেখেন তাতে জ্বরের মিক্সচারের সঙ্গে ভয়ানক বিষ প্রসিক এসিড মেশানো। গল্পে গোয়েন্দার কাজ হল এই অপরাধটি কে করল আর কেমনভাবে করল তা খুঁজে বের করা।

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে বিষ ব্যবহারের নতুনত্বের কথা যদি বলতেই হয় তাহলে প্রথমেই মনে আসবে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের এক নম্বর বই হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *অন্ধকারের বন্ধু* (প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১-এ, মুদ্রণ সংখ্যা ১২০০)। হেমেন্দ্রকুমার এই নতুন সিরিজটির জন্য সৃষ্টি করলেন এক নতুন গোয়েন্দা জুটি। হেমন্ত ও রবীন। হেমন্ত আবার বিশেষ ভাবে বিজ্ঞানচর্চাতেও আগ্রহী। তা না-হলে এমন এক জটিল খুনের কিনারা তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। ঘটনার সূত্রপাত ধনবান মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের খুন দিয়ে। মৃতদেহটি পাওয়া যায় তাঁর নিজের শয়নকক্ষে। খাটের তলায়। "তাঁর মুখের উপরে দারুণ যাতনা ও ভয়ের চিহ্ন—সেইসঙ্গে রয়েছে বিষম বিস্ময়েরও আভাস। [...] তাঁর গলার উপরে একটা নীল দাগ। বিছানার উপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন।"

নীল দাগের কারণ খুঁজতে-খুঁজতেই ধরা পড়ে আসল রহস্য। পাঠক পরিচিত হয় দ্রবীভূত বাতাসের সঙ্গে। "বাতাসের তাপ যখন শূন্যের দুশো সত্তর ডিগ্রী নীচে নামানো যায় বাতাস তখনি হয় দ্রবীভূত। তাকে তখন দেখতে হয় একরকম জলের মতই, আর জলের মতই তাকে এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে ঢালা চলে। দ্রবীভূত বাতাস বিষম ঠাণ্ডা।" খুনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এই দ্রবীভূত বাতাসই। গোয়েন্দাও স্বীকার

করতে বাধ্য হয়,"দ্রবীভূত বাতাসের এমন ভয়াবহ ব্যবহার পৃথিবীর আর কোন অপরাধী বোধহয় জানে না।"

গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা যে একজন অন্যজনের লেখা পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এমন নজির ভূরি-ভূরি। কেউ সরাসরি স্থান-কাল-পাত্র পালটে অন্যের প্লট ব্যবহার করেছেন আবার কাউকে দেখা গেছে বিশেষ একটি ঘটনা বা মুহূর্তকে ব্যবহার করতে। গোয়েন্দা গল্পের লেখক হিসেবে মণি বর্মার নাম পাঠক মহলে একসময় বেশ পরিচিত ছিল। তাঁর একটি গল্পের নাম, 'স্বামীহীন বিবেকানন্দ'। গল্পে গোয়েন্দার ভূমিকায় দেখা যায় বিবেকানন্দ ঋষিকে। এই বিবেকানন্দ আই. বি. ব্রিউয়ারিজের সেলস ম্যানেজার। ওই কোম্পানির সাপ্লাই করা মদ খেয়ে মারা যান কুমার সাহেব। পুলিশ সন্দেহ করে মদের সঙ্গে মেশানো হয়েছিল বিষ। আর ডাক্তারদের অনুমান বিষটা নিকোটিন জাতীয়। পুলিশি অনুসন্ধানের সময় অকুস্থলে হাজির হয় বিবেকানন্দ ঋষি। কোম্পানির সুনাম আর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সে একের পর এক যুক্তি নির্ভর সওয়াল জবাব শুরু করে। সন্দেহভাজনের এ হেন সক্রিয় চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত জানা যায় আসলে কে কী ভাবে ওই বিষের ব্যবহার করেছিল। মূল গল্পটির লেখক আগাথা ক্রিস্টি। মণি বর্মা কেবল দেশি ঠাঁটে তা পরিবেশন করেন।

১৮৯০-এ প্রকাশিত হয় আর্থার কোনান ডয়েলের *দ্য সাইন অব ফোর*। কাহিনির পাঠক পরিচিত হয় প্রাচ্যের অস্ত্র ব্লো-পাইপের সঙ্গে। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে নতুন করে সেই অস্ত্রটি ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। *শনি মঙ্গলের রহস্য* কাহিনিতে অপরাধীকে ব্যবহার করতে

অন্ধকারের বন্ধু

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দেখা গেল ব্লো-পাইপ। হেমেন্দ্রকুমার অবশ্য এক নতুন নামে এই অস্ত্রের পরিচয় করালেন পাঠকদের। গোয়েন্দা জয়ন্তর কথায়, বোর্নিয়োর আদিবাসীরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে তার নাম সুম্পিটান।

"সুম্পিটান হচ্ছে সুদীর্ঘ লাঠির মতন একটা জিনিস, যার ভিতরটা হচ্ছে ফাঁপা। [...] তার ভিতরে থাকে সাগুকাঠে তৈরী একটি নয়-দশ ইঞ্চি সূক্ষ্ম শলাকা, আর সেই শলাকায় মাখানো থাকে 'ইপো' গাছের তীব্র বিষ। [...] সজোরে ফুঁ দিলে ভিতরকার শলাকাটি তীর বেগে বহুদূর ছুটে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করে।"

খুনের পদ্ধতিতে কোনো হেরফের না-করে পুরোটাই দেশি ছাঁচে ঢেলে পরিবেশন করতে দেখা গেল নীহাররঞ্জন গুপ্তকে। 'বাঘনখ' গল্পে খুনিকে দেখা যায় বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তিরধনুক বানাতে। তিরের ফলায় মাখানো হয়েছিল তীব্র কুরারি বিষ। সেই বিষাক্ত তির ছুঁড়ে ভিক্টিমকে খুন করা হয়।

খুন করার জন্য সাপের বিষ একটা অত্যন্ত চেনা উপকরণ। সেই সাপের বিষ ঘিরেই হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি *নীলসায়রের অচিন্ পুরে* ব্যয় করলেন একটি অধ্যায়। খোদ লন্ডন শহরে পর পর সাপের কামড়ে মৃত্যু হল একাধিক ব্যক্তির। বিভ্রান্ত ইংরেজ পুলিশ। শেষ পর্যন্ত এই মৃত্যুরহস্যের জট ছাড়াতে সক্ষম হল বাঙালির ছেলে বিমল। অপরাধী বার্ত্তোলোমিও গোমেজের জন্মও ভারতে। তাই সাপ ও বিষ কোনোটাই তার কাছে অচেনা ছিল না। পরিকল্পনা করে সেই খুনগুলো করছিল।

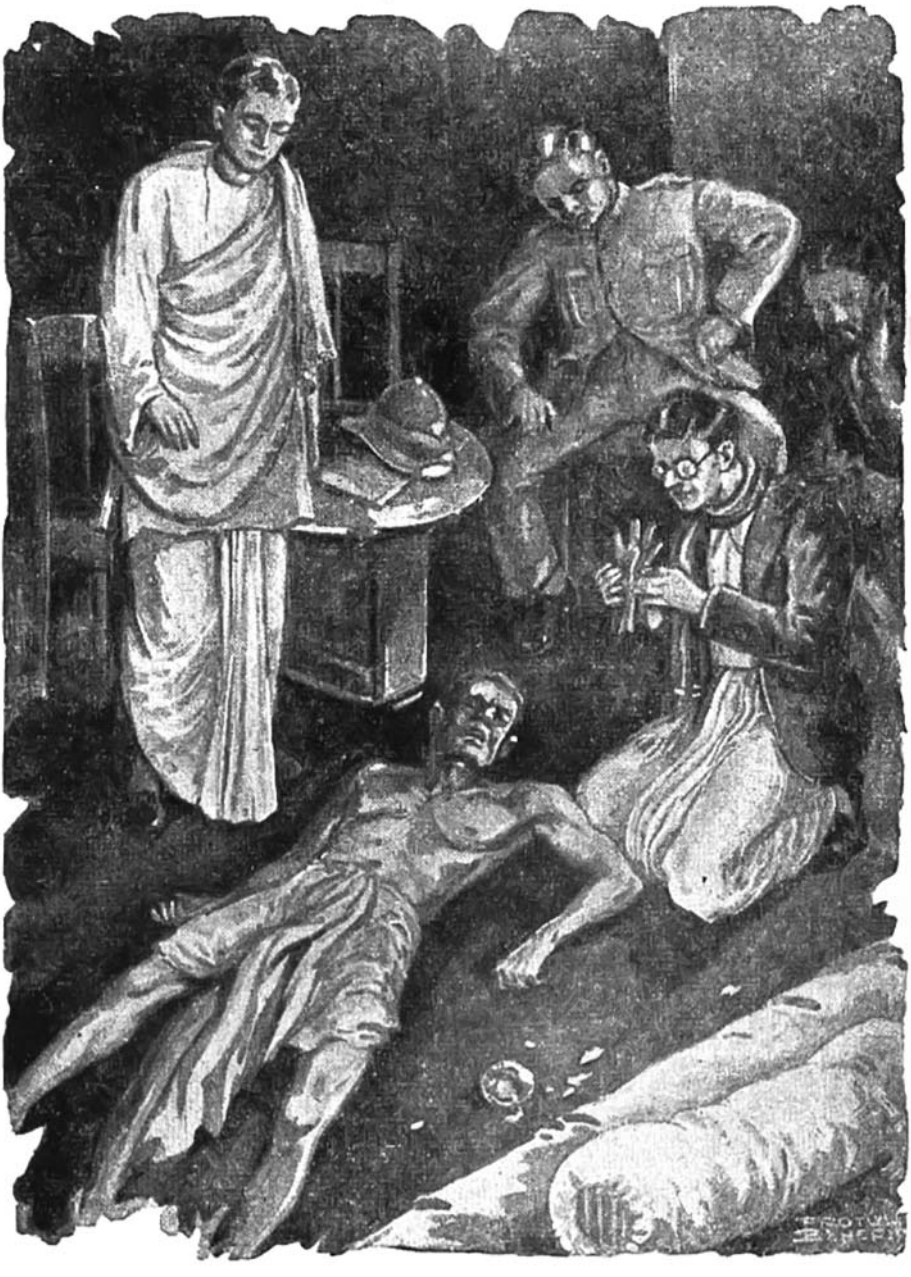

"হুঁ, গেলাস-ভাঙা কাঁচে দস্তানার খানিকটা কেটেও গিয়েছে দেখছি।"

শিল্পী: প্রতুল বন্দোপাধ্যায়

তার কাছ থেকেই মিলল রুপো দিয়ে গড়া একটা সাপের মুখ যা ছিল খুনের হাতিয়ার। "এই সাংঘাতিক যন্ত্রটা একেবারে সাপের মুখের আকারে তৈরি করা হয়েছে—এমন কি এই কলের মুখটা কাউকে কামড়ালে ঠিক সাপে কামড়ানোর মতন দাগ পর্যন্ত হয়। এর ফাঁপা বিষ দাঁতটা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতে বিষ ঢেলে দেয়।"

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দুর্গরহস্য*। এখানেও অপরাধীকে খুনের জন্য বেছে নিতে দেখা যায় সাপের বিষ। বার্ত্তোলোমিওর মতো মণিলালও চৌখশ অপরাধী। তার অস্ত্র রুপো দিয়ে তৈরি সাপের মুখ নয়, বরং আপাত নিরীহ ফাউন্টেন পেন। পার্কার কলমে কালির বদলে ভরা থাকত সাপের বিষ। শরীরের লাগসই জায়গায় নিব ফুটিয়ে পিস্টনে চাপ দিলেই কেল্লা ফতে। সাপের ছোবলের সঙ্গে পেনের নিবের সূক্ষ্ম ফুটোর ফারাক করাটা ছিল সত্যিই কঠিন। সেই কঠিন কাজটাই সমাধান করে ব্যোমকেশ। তার মুনশিয়ানা আর কেরামতিতেই ফাঁস হয়ে যায় মণিলালের এত সাধের কৌশল।

সময় পালটেছে, আবিষ্কার হয়েছে নানা নতুন-নতুন কল-কবজা ফলে অপরাধীরাও তাক মাফিক সে সবের ইস্তেমাল করা শুরু করেছে। কিন্তু অনেক সময়ই তাদের মোডাস অপারেন্ডি দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় সময়ের ব্যবধান সত্যি-সত্যি তাদের চিন্তা ভাবনায় খুব একটা বদল ঘটিয়েছে কিনা। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *সাজাহানের ময়ূর*। গোয়েন্দা জয়ন্তকে পথ থেকে সরানোর জন্য একাধিকবার প্রাণনাশের চেষ্টা করে দুষ্কৃতকারীরা। একবার তাদের টার্গেট হয় গোয়েন্দার বসার গদি মোড়া চেয়ারটি। গোয়েন্দার সজাগ চোখে ধরা পড়ে

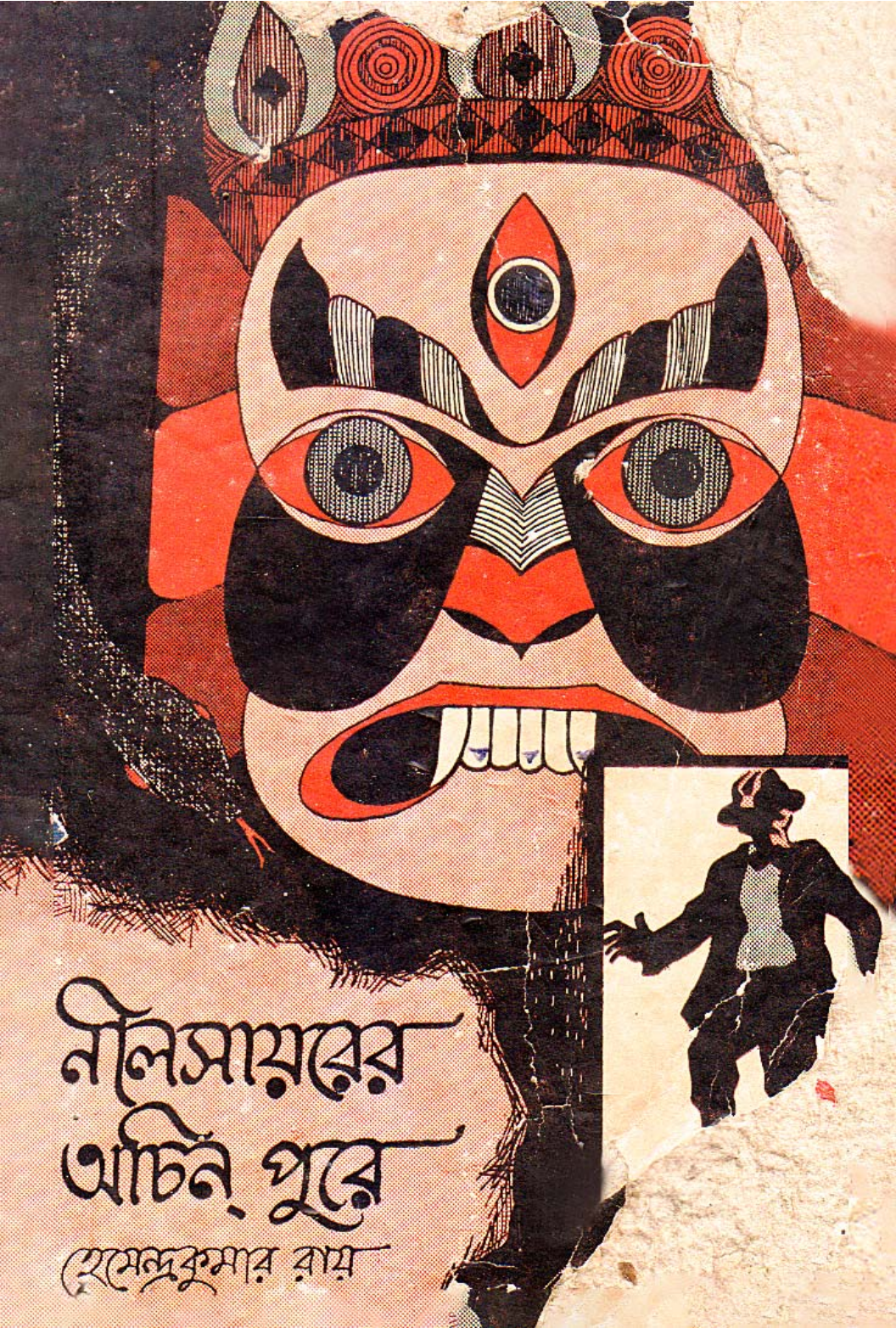

নীলসায়রের অচিন্ পুরে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

কয়েকটি অসঙ্গতি। আন্দাজ করতে ভুল হয় না কিছু একটা গোলমাল হয়ে রয়েছে। "[...] জয়ন্ত ফুটোর চারিপাশ থেকে গদির চামড়ার খানিকটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে কাটা অংশটা তুলে নিয়ে বললে, 'এইবার দেখুন সুন্দরবাবু'— 'কি ওটা? গদির ভিতর সোজা ভাবে গাঁথা রয়েছে একটা চকচকে ইস্পাতের শলাকা।'— 'হ্যাঁ, আমার মারণ অস্ত্র! আজ এই গদিতে বসলে সেই বসাই হত আমার শেষ বসা! ও শলাকাটা যে বিষাক্ত, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!"

১৯৯৩-এ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি কাহিনি লেখেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *সোনার মেডেল*। এখানেও কাহিনির প্রধান চরিত্র বাবু মিত্তিরের উপর নেওয়া হয় একাধিক প্রাণঘাতী অ্যাটেম্পট। তার মধ্যে একবার হুবহু না হলেও মিল পাওয়া যায় হেমেন্দ্রকুমারের আখ্যানের। "[...] তিনি খুব সাবধানে চাদরটা তুললেন। ছুঁচটা দেখতে পেলেন মিনিট দুয়েকের চেষ্টায়। তিনি শুলে তাঁর কোমর যেখানে থাকবার কথা ঠিক সেখানে খুব বুদ্ধি করে তোশকে সেলাইয়ের মধ্যে ছুঁচটা গোঁজা আছে।" সময়ের ব্যবধানে ধাঙড়ের ছদ্মবেশে দুষ্কৃতকারী পালটে গেছে পেষ্ট কন্ট্রোলের লোকে আর বিষাক্ত শলাকা হয়েছে রেডিয়ো-অ্যাকটিভ ছুঁচ, যার সংস্পর্শে এলে ক্যানসার নিশ্চিত।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে বিদেশি গল্পের প্রভাবের কথা যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমন আবার কোনো-কোনো বাঙালি লেখক বিষের ব্যবহারে নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন সে-কথাও বলতে হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছিলেন।

"এইবারে দেখুন সুন্দরবাবু!"

শিল্পী: প্রতুল বন্দোপাধ্যায়

তাঁর তৃতীয় ডিটেকটিভ উপন্যাসের নাম, *পরলোকে পুলস্ত্য চৌধুরী*। প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে। বিখ্যাত শিল্পী পুলস্ত্য চৌধুরীর মৃত্যুকে ঘিরে আবর্তিত হয় রহস্য। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হয় এই মৃত্যু স্বাভাবিক, বিষক্রিয়া বা হত্যার কোনো চিহ্ন নেই। স্থানীয় পুলিশ তবুও পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না। তাই তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখা যায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার হাজরার। অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধীরে-ধীরে জানা যায়, পুলস্ত্য চৌধুরীকে খুন করা হয়েছিল এক অভিনব পদ্ধতিতে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল তা শোনা যাক মিস্টার হাজরার মুখেই, "ইনসুলিন হচ্ছে Pancreas-এর natural secretion। ডায়াবিটিসের রুগিকে insulin দেওয়া হয় তার রক্তে sugar-এর আধিক্য প্রশমিত করার জন্য। কিন্তু যার রক্তে sugar-এর আধিক্য নেই, তাকে insulin inject করলে তার রক্তে sugar এর পরিমাণ খুবই কম হয়ে পড়বে, ফলে সে air hungry হয়ে ছ-সাত ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে।

সুতরাং দেখছেন তো, যার ডায়াবেটিস নেই, এমন লোককে ইনসুলিন injection দিয়ে অনায়াসেই হত্যা করা যায়, সে-লোক যদি অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। আর এইভাবে যদি ইনসুলিন injection-এর ফলে কারও মৃত্যু হয়, তা post mortem পরীক্ষাতেও ধরা পড়বে না।"

সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষ ব্যবহারের উল্লেখ মেলে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'লা' বলে একটি গল্পে যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭২-এ। গল্পে তিনি আমদানি করলেন অভিনব এক বিষাক্ত গুল্মের, গাছটির নাম লাইকোমেসাস। নেপালি ভাষায়—

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী

পিয়োজি। এক অধ্যাপকের হত্যা ঘিরে এই রহস্য যার সমাধান করে পারিজাত বক্সী। অধ্যাপককে কীভাবে খুন করা হয়েছিল তা গল্পের শেষে জানা যায় পারিজাতের কথায়, "নেপালে একেবারে হিমালয়ের পাদদেশে ছোট ছোট ঝোপ আছে। অবশ্য খুব বেশি দেখা যায় না। এদের ফুল অত্যন্ত বিষাক্ত। এত বিষাক্ত যে তার কাছ দিয়ে যে জন্তু আনাগোনা করে সে-ই মারা যায়। হরিণ, খরগোশ, চিতা এরা এই ঝোপ দেখলেই পাগলের মতন ছুটে পালায়। গাছ বিষাক্ত নয়, শুধু ফুল থেকে নির্গত বিষাক্ত প্রাণঘাতী গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাও প্রায় মিনিট পনেরো। তারপরই ফুলটি শুকিয়ে যায়, তখন আর অনিষ্ট করার কোনো ক্ষমতা থাকে না।"

এই গাছটির সন্ধান জানা ছিল ঘাতকের। কুঁড়ি সমেত সেই গাছের ডাল অধ্যাপকের কাজের ঘরের ড্রয়ারের ফাঁকে সে আটকে দেয়। ঘাতক জানত বারো ঘণ্টা পর কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফুটবে আর তীব্র বিষগন্ধ ছড়াবে। অধ্যাপক যে ভোর পাঁচটায় কাজের ঘরে ঢোকেন তা অজানা ছিল না বলেই এত আঁটঘাঁট বেঁধে পরিকল্পনাটি করা। চেয়ারে বসতে না বসতেই অধ্যাপকের ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক সব মারণ অস্ত্র, আশা করাটাই স্বাভাবিক ছিল যে বিষের ব্যবহারে দাঁড়ি পড়বে। উলটে আমরা পরিচিত হলাম আরও নতুন দু-টি যুদ্ধ পদ্ধতির সঙ্গে—কেমিক্যাল ওয়র আর বায়োলজিক্যাল ওয়র । এগুলি আবার ব্যাপকতর অর্থে বিষ ব্যবহারেরই নামান্তর। লক্ষ্য একজন বা দুজন ব্যক্তি বিশেষ নয়,কোনো একটি রাষ্ট্রের মানবগোষ্ঠী। লড়াই যখন দু-টি

সাপ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথমে বিজয়ের খেয়াল হ'ল।

পরীক্ষার শেষ দিন। দল বেঁধে সবাই হল-এর বাইরে এল। প্রশ্নপত্র খুব কঠিন হয়নি। সকলেই মোটামুটি ভালই লিখেছে। বিজয়, পবিত্র, অলকেশ আর সরোজ।

বিজয় বলল, হ্যাঁরে মানস কোথায় গেল? ঘণ্টা বেজে গেছে, এখনও নিশ্চয় হল-এর মধ্যে নেই।

পবিত্র পাশেই ছিল। বিজয়ের দিকে ফিরে সে বলল, মানস তো আজ পরীক্ষা দিতেই আসে নি। আমার সামনেই তার সীট। সীট তো সকাল থেকে খালি।

সকলেই বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। মানস লেখাপড়ায় ভাল। স্কুল তার ওপর অনেক আশা রাখে। হায়ার সেকেনডারিতে বিজ্ঞান বিভাগে সে ভালই করবে শিক্ষক-দের বিশ্বাস।

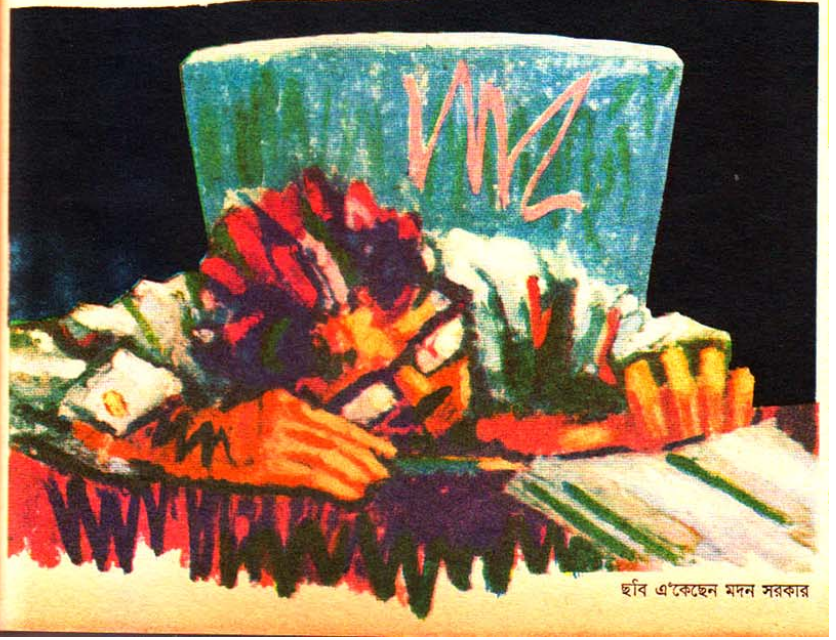

ছবি এঁকেছেন মদন সরকার

রাষ্ট্রের মধ্যে তখন কেই-বা আর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। রাষ্ট্রের নির্দেশে তাই বৃহত্তর নাশকতার আগে ময়দানে যারা অবতীর্ণ হয় তাদের পোশাকি নাম এজেন্ট। কিছুদূর পর্যন্ত এদের কাজকর্ম, ধরন-ধারণ চলতি গোয়েন্দাদেরই মতো। কিন্তু রাষ্ট্রের মদত থাকায় এরা যে সীমায় পৌঁছতে পারে একজন গোয়েন্দার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব নয়। এজেন্টদের নানা কীর্তি কলাপ নিয়ে লেখা হয়ে চলেছে অসংখ্য গল্প-উপন্যাস। অপরাধ সাহিত্যেও তাই জন্ম নিয়েছে এক নতুন ধারা। অন্যদিকে চিরাচরিত গোয়েন্দা সাহিত্যেও বিষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে না। খুব সম্ভব এর একটাই কারণ। সফল গোয়েন্দা কাহিনির বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে থাকে জটিল রহস্যের উপর। বিচিত্র আর জটিল রহস্যের জট পাকাতে বিষের কোনো জুড়ি নেই। বাস্তবেও তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ফরেন্সিক মেডিসিন। জটিল থেকে আরও জটিল,নতুন থেকে আরও নতুন বিষের ব্যবহার যেন চিহ্নিত করা যায়। ধ্রুপদি ঘরানার গোয়েন্দা কাহিনির অনুসারী লেখক আর পাঠক কারো পক্ষেই পুরোপুরি বিষমুক্ত হওয়া তাই অসম্ভব।

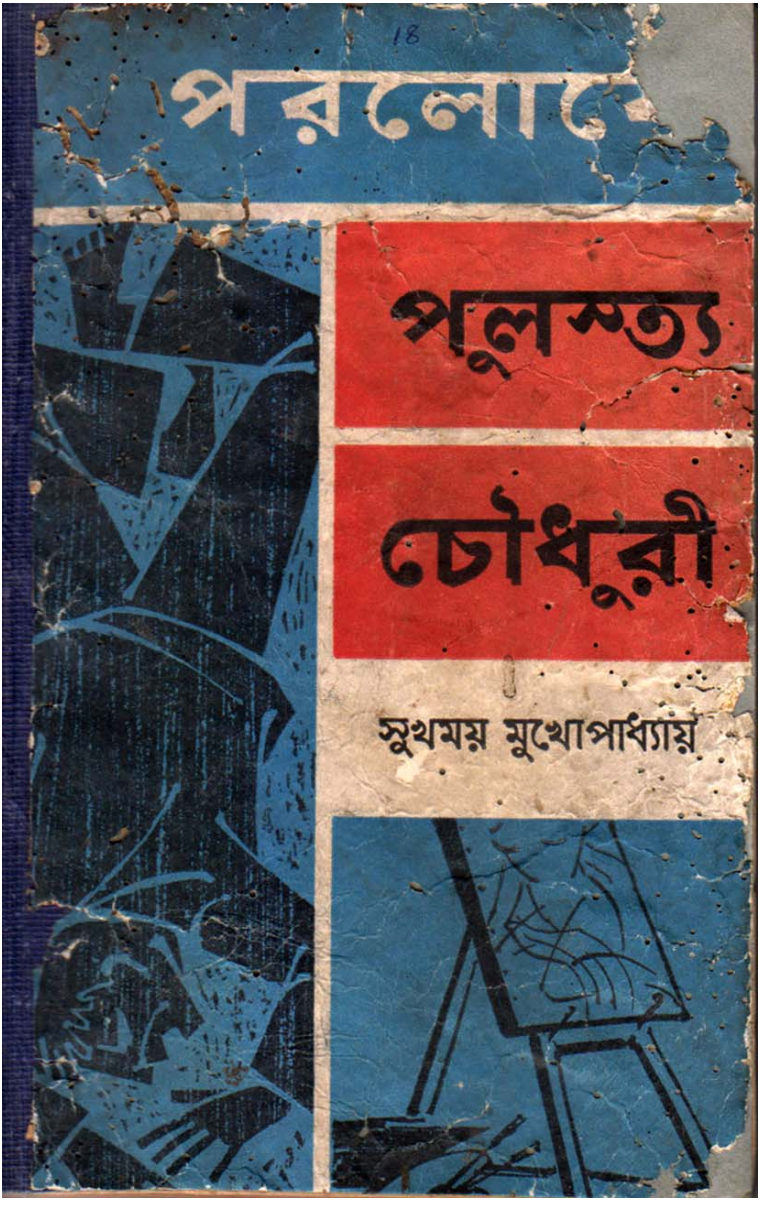

শিল্পী: খালেদ চৌধুরী

প্রকাশিত